নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিকতা: ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা সংসদের অন্তর্গত দর্শনশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষক

দেবব্রত সরদার

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ দীপায়ন পট্টনায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০২৫

নিরীশ্বরবাদ ও নৈতিকতা: ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

রূপরেখা

দর্শন চিন্তার যে পাশ্চাত্য ধারা লক্ষ্য করা যায় তা থেকে দর্শন চিন্তার ভারতীয় ধারাটি নানা কারণে অনন্য। এই অনন্যতা যেমন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমনি উৎসভূমিতেও। যে শব্দটিকে ঘিরে পাশ্চাত্যে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত সেই 'ফিলোসফি'র আক্ষরিক অর্থ জ্ঞানানুরাগ। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে কী রহস্য অবগুণ্ঠিত রয়েছে তার উন্মোচন প্রাচীন যুগ থেকে পাশ্চাত্য চিন্তকদের প্রলুব্ধ করেছে, জাগতিক ঘটনারাজি তাদের বিস্মিত করেছে এবং সঞ্চার করেছে জগত রহস্যের জাল ছিন্ন করার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার। এই জিজ্ঞাসা অনেকখানি অহৈতুকী; যাপিত জীবনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। ভারতীয় পরম্পরায় যাকে দর্শন বলা হয় তা কিন্তু ঠিক জ্ঞানানুরাগ বা দর্শনানুরাগ নয়, বরং একপ্রকার অবলোকন বা অন্তর্দৃষ্টিলাভের প্রক্রিয়া যা বৈচিত্র্যের অন্তরালে থাকা মূলতত্ত্বের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এই দার্শনিক মনন অহেতুক বা জীবনবিমুখ নয়। ভারতবর্ষের দর্শন চিন্তার সূত্রপাত যাপিত জীবনের প্রয়োজনকে অবলম্বন করে। সাংসারিক জীবনে নানাবিধ দুঃখ যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয় মানুষকে, জরা ব্যাধি মৃত্যুর আশঙ্খা যেমন মানবকে পীড়িত করে তেমনি সংসার জীবনের গ্লানি তাপ তার চিত্তকে ব্যথিত করে। এই দুঃখ যন্ত্রণা দ্বন্দ্বের তাপ হতে মুক্তি পেতে চায় মানুষ। সে সন্ধান করে সেই উপায় যা তাকে দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি দেবে। দুঃখ থেকে এই অত্যন্ত মুক্তি কিভাবে সম্ভব তা সন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিক চিন্তার সূচনা ঘটেছে ভারতীয় মনীষীদের ভাবনায়।

কাজেই ভারতীয় পরম্পরায় দর্শন আসলে একপ্রকার জীবন জিজ্ঞাসা। এই জীবন জিজ্ঞাসার সূত্রেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা, ধর্মজিজ্ঞাসার জন্ম। সুতরাং ইউরোপীয় পরম্পরায় যেভাবে দর্শনের

পৃথক পৃথক শাখা হিসাবে অধিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যা নীতিবিদ্যা এসবের জন্ম হয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, আন্বিক্ষীকিবিদ্যা এসবের জন্ম সেভাবে হয়নি। বরং জীবন জিজ্ঞাসার অঙ্গ হিসেবে জন্ম নিয়েছে তত্ত্ববিদ্যা, প্রমাণশাস্ত্র প্রভৃতি। যেহেতু জীবনজিজ্ঞাসা বা মুমুক্ষুর মুক্তি জিজ্ঞাসা থেকে প্রায় সব ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের জন্ম তাই ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি হলো এক একটি মোক্ষশাস্ত্র। 'শাস্ত্র' কথাটি এসেছে 'শাস্' ধাতু থেকে যার অর্থ শাসন বা উপদেশ। শাস্ত্র কিছু বিধি ও নিষেধের মধ্য দিয়ে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান দেয়। তেমনই মোক্ষশাস্ত্রগুলি মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তি ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে ভারতীয় দর্শনে জন্ম ধর্মশাস্ত্রের। ধর্ম শব্দটির প্রায়শই সম্প্রদায় বিশেষে আচরিত প্রচারমূলক ধর্মকে বোঝালেও বৈদিক পরম্পরায় ধর্ম নীতিরই বাচক। তাই পাশ্চাত্যে যাকে এথিক্স বলা হয় ভারতীয় পরিভাষায় তা প্রায় ধর্মশাস্ত্রের সমার্থক।

পাশ্চাত্যের নীতিবিদ্যা বা ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র উভয়ের লক্ষ্য হল সমাজ জীবনে নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির আচরণকে নৈতিকতার বাঁধনে আবদ্ধ করতে না পারলে সমাজ জীবনও যে সুস্থ মসৃণভাবে চালিত হতে পারে না সেই উপলব্ধি থেকে উভয় শাস্ত্রের জন্ম। এখন প্রশ্ন হল সমাজে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি তার আচরণকে নীতিসম্মত পথে চালিত করবে কেন? অর্থাৎ একজন ব্যক্তির নৈতিক জীবন যাপনের প্রণোদন কি হবে? প্রশ্নটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করলে তা হবে এরূপ নৈতিক বাধ্যতা বোধের উৎস কী? আমি কেন নৈতিক কর্মে নিয়োজিত হব বা একজন ব্যক্তির ধর্মের জীবনযাপনের প্রণোদন কী হবে এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান যেমন পাশ্চাত্য দর্শনে হয়েছে তেমনই ভারতীয় দর্শনেও হয়েছে।

একজন ব্যক্তি তার জীবন কেন নৈতিকভাবে যাপন করবে তার উত্তর দিতে গিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকরা একমত হতে পারেননি। পরার্থ প্রবৃত্তিকে নৈতিক কর্ম বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শনে। স্থূল সুখবাদী ছাড়া পাশ্চাত্যে প্রায় সকল নৈতিক মতবাদই পরহিতে কর্মকে নৈতিক কর্ম বলে অনুমোদন করেন। তবে ঠিক কেন পরহিতে বা পরকল্যাণে নৈতিক কর্তার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নে পাশ্চাত্য নীতি চিন্তকরা একমত হতে পারেননি। এব্যাপারে কর্তব্যবাদীদের (Deontologist) দাবি থেকে উদ্দেশ্যবাদীদের (Teleologist) দাবি যেমন আলাদা, তেমন-ই স্থূল সুখবাদীদের থেকে উপযোগবাদীদের বক্তব্য ও আলাদা। কর্তব্যবাদীরা পরার্থে কর্মকে কর্তব্য বলে মানেনি কিন্তু তা কোন ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নয়। এই কর্তব্যবাদীদের মধ্যে কান্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কান্টের মতে নৈতিক জীবন হল বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা চালিত জীবন। সুখ শান্তির মত কোন প্রাকৃতিক প্রণোদন (Natural Inclination) নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ হতে পারে না। একদিকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি অন্যদিকে সদিচ্ছা দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ নৈতিক কর্ম করে। এই নৈতিক কর্ম তার কাছে বিবেকের নির্দেশ, এই নির্দেশকে অমান্য করা যায় না শুধুমাত্র কর্তব্য হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে হয়। কাজেই অন্যের জন্য মানুষ যখন কিছু করে তখন সে কোন প্রাপ্তির জন্য ওই কাজে ব্রতী হয় না, কর্তব্যের জন্য ওই কর্তব্য সম্পাদন করে সে।

এই কর্তব্যবাদের বিপরীতে রয়েছে ফলাফল সাপেক্ষবাদ সেখানে ফলের গুরুত্ব বিচার করে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। এই ফল কোথাও আত্মসন্তুষ্টি দেয় কোথাও পরসন্তুষ্টি। আত্ম বা পর কার উদ্দেশ্য পূরণ করলে একটি কর্ম নীতিগতভাবে ভালো হবে বা নৈতিক কর্ম হবে এই প্রশ্নে আত্মবাদী থেকে পরবাদী রয়েছে পৃথক অবস্থানে। আত্মবাদীর কাছে আপন সুখ বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সকল কর্মের প্রণোদন হলেও পরবাদী উপযোগবাদীরা পর সুখের কথা বিচারে রাখেন।

উপযোগবাদের যেমন নানারূপ আছে, তেমনই উপযোগের ব্যাখ্যাও সর্বত্র এক নয়। তথাপি পাশ্চাত্য উপযোগবাদীদের প্রায় সবাই সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শটিকে অনুমোদন করেন। যা যতবেশী উপযোগী, তা যে ততবেশী গ্রহণযোগ্য এমন একটা ধারণা সাধারণ্যেও প্রচলিত। লৌকিক ধারণা যখন দার্শনিকতত্ত্বের ছত্রছায়া লাভ করে, তখন সেই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়। পাশ্চাত্য উপযোগবাদের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে। সুখ যে তার ঈপ্সিত সেই সত্যটিকে, মানুষ যেমন লুকোতে পারে না, তেমনি স্থূল আত্মসুখের মধ্যে স্বার্থপর জীবন যাপনও সামাজিক জীব হিসাবে তার অনুমোদন পায় না। অন্যের প্রতি কর্তব্যের দায়ও সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সমস্ত রকম বাহ্য প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে কর্তব্যের জীবন যাপনের কান্টীয় আদর্শকে মেনে নিতেও সে গররাজি। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার একটা চেষ্টা সে খুঁজে পায় ইউটিলিটিতত্ত্বে। এই তত্ত্ব আত্মসুখের সঙ্গে পরসুখের এমন এক মেলবন্ধন ঘটাতে চায় যেখানে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে মানুষকে পরার্থসিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে হয়।

নৈতিকতার স্বপক্ষে ভারতীয় দর্শনে কী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তা দেখা যাক। ভারতীয় দর্শনে পরার্থে কর্মের কথা যে গ্রন্থে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে তা হল শ্রীমদ্ভগবত গীতা। নৈষ্কর্মের বিরোধিতা করে গীতাকার কর্মের জীবনযাপনের উপদেশ করেছেন; আর যে কর্মকে তিনি মানুষের আদর্শ কর্ম হিসেবে দেখেছেন তাহল নিষ্কাম কর্ম। ফলের অভিলাষ থেকে মুক্ত হয়ে এবং কর্তৃত্বাভিমান শূন্য হয়ে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাই হল নিষ্কাম কর্ম। এই আদর্শে অনুষ্ঠিত কর্ম লোকহিতের-ই নামান্তর। এই লোকসংগ্রহের পথই কর্মের গীতোক্ত পথ। সুতরাং পরার্থে কর্মই ভারতীয় ঐতিহ্য। তবে এটি নিছক কর্তব্যের জন্য কর্তব্য রূপ পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবি করাটা ঠিক হবে না। যদিও গীতাকার স্পষ্ট বলেছেন-

“কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি”।।

কী উদ্দেশ্যে বা কোন অভিলষিত বস্তুকে পাওয়ার লক্ষ্যে নৈতিক বা ধর্মীয় জীবনের অনুগমন ভারতীয় পরম্পরায় তার একটাই উত্তর মোক্ষ বা মুক্তি। ভারতীয় ঐতিহ্যে মোক্ষই নৈতিকতার প্রেরণা মোক্ষই পরম পুরুষার্থ আর ধর্ম বা নৈতিকতা হল তা লাভের উপায়। এ বিষয়ে ঋক্বেদে স্পষ্ট ঘোষণা- ‘আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ’ কাজেই জগতের হিত বা পরার্থে কর্মের অন্যপ্রান্তে যে আত্মমুক্তির মহতী প্রেরণা রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। মোক্ষই সেই পরম লক্ষ্য যা ব্যক্তিকে শুধু বিশেষ বিশেষ কর্মে প্রণোদিত করে না, নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলতে এক কথায় জীবনের নৈতিক ধারাকে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মোক্ষ বড়জোর নৈতিক জীবনের প্রেরণা হতে পারে। একে নৈতিক জীবন-যাপনের স্বপক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি বলে দাবি করা যায় না। প্রথমত, যুক্তি বলতে যদি তর্কশাস্ত্রীয় ভিত্তিকে বোঝায় তাহলে একথা স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে মোক্ষ নৈতিক জীবনের ওইরকম যৌক্তিক ভিত্তি হতে পারে না। কেন মানুষ নৈতিক জীবনকে বেছে নেবে তার স্বপক্ষে আদৌ কোন হেতুবাক্য এই উত্তর থেকে পাওয়া যায় না। কাজেই নৈতিক জীবনের বৌদ্ধিক ভিত্তিভূমি ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কী হতে পারে তা বিচার্য বিষয়। তবে সে বিচারের পূর্বে একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যায় প্রশ্নটি হল মোক্ষ কি আদৌ ধর্মীয় বা নৈতিক জীবনের একটি প্রেরণা হতে পারে? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক, কারণ বিষয় কোন কাজের প্রেষণা বা প্রেরণা হতে পারে তখনই যদি ওই বিষয়টি আকর্ষণীয় বা মূল্যবান হয়। নৈতিক জীবন বা ধর্মের জীবন এই অর্থে আকর্ষণীয় নয়। প্রশ্ন হল মোক্ষ কি নৈতিক জীবনের তুলনায় আকর্ষণীয় বা মূল্যবান?

প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের ধারণাটি সর্বত্র একরকম নয় তা সত্ত্বেও নানা সম্প্রদায়ের মোক্ষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিন্দুতে এসে মিশে যায়। কিছু সাধারণ মত রয়েছে যেগুলিতে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে ঐক্যমত্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন মোক্ষ হল এক উত্তেজনা রহিত, নির্মল এবং অন্তহীন সুখ ও প্রশান্তির অবস্থা। এ হল সর্বাধিক দুঃখ যন্ত্রণার চিরতরে নিরসন। জন্ম মৃত্যু চক্রের চিরসমাপ্তি ঘটে এই মোক্ষে। এ এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ তার চির ইপ্সিত ঈশ্বরাদি পরম লক্ষ্যে উপনীত হয় বা সান্নিধ্য লাভ করে। এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে মোক্ষ তত্ত্বগত এক অবস্থা যাকে নানাভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো সব দিক থেকে বিবেচনা করে মোক্ষকে কী আকর্ষণীয় বলে বর্ণনা করা যায়? শাশ্বত সুখ ও প্রশান্তির জীবন কি ধর্মের জীবন থেকে অধিক আকর্ষণীয়? অবশ্যই নয় সব ক্ষেত্রে তো নয়ই। সুখ প্রশান্তি এসব তখনই অর্থবহ হয় যখন যাপিত জীবনটি প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে, কারণ অসুখের মধ্যেই মানুষ সুখ খোঁজে, অশান্তি থেকে মুক্তির জন্যই শান্তির খোঁজে উন্মুখ হয়। দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেই সন্ধান করে প্রশান্তির। কেউ যদি শাশ্বত সুখের এক জীবন লাভ করে তাহলে সেই জীবন আর আকর্ষণীয় থাকে না। পরিবর্তনহীন সে জীবন একঘেয়ে ক্লান্তিকর পথ চলায় পর্যবসিত হয়। শাশ্বত জীবনের মধ্যে সেই অর্থে কোন চাকচিক্য থাকতে পারেনা। সুতরাং যা শাশ্বত তাই যে আকর্ষণীয় হবে- আমাদের অভিজ্ঞতা সে কথা বলে না। শাশ্বত প্রশান্তির অবস্থা চিরমঙ্গলের অবস্থাও নয়। মূল্যের দিক থেকে বিচার করলেও মোক্ষ ধর্মের থেকে আবশ্যিকভাবে উচ্চতর নয়। যদি মোক্ষকে উচ্চতর বলা হয় তবে প্রশ্ন উঠবে কেন তা উচ্চতর? সম্ভবত এর উত্তরে মোক্ষবাদীরা বলবেন এটিই পরমমূল্য বা লক্ষ্য এর থেকে মূল্যবান কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় ঠিক কি কারণে তারা মোক্ষকে পরম মূল্যের মর্যাদা দেন? কোন অর্থে

মোক্ষ শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য বা নিঃশ্রেয়স? কেনই বা ধর্মকে সেই নিরতিশয় শ্রেয়ের মর্যাদা দেওয়া যাবে না? ধর্মকেই কি পরম মূল্য বলা যায় না? ঘুরে ফিরে উত্তর কিন্তু এক মোক্ষ শাশ্বত সুখের জীবন দেয়, ধর্ম যা দিতে পারেনা। মোক্ষকে লক্ষ্য করে ধর্মকে তার উপায় বলে দাবি করা একটি কুসংস্কার বলে মনে করা হয়। আর এই কুসংস্কারকে হাতিয়ার করেই ধর্মের তুলনায় মোক্ষকে উচ্চতর স্থান দিই আমরা। কিন্তু লক্ষ্যকে উপায়ের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া সব ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে আমরা গান্ধীর কথা ভাবতে পারি, তাঁর রচনায় বাপুজী লক্ষ্য ও উপায়কে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। আবার নৈতিকতা বা ধর্মের পক্ষে যদি যুক্তির কথা ওঠে তাহলে মোক্ষর ক্ষেত্রেই বা সেই যুক্তি দাবি করা হবে না কেন? ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির দাবি পেশ করে মোক্ষের পক্ষে যুক্তির দাবীকে ছাড় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ মোক্ষকে পরম লক্ষ্য হিসেবে চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া একটি কুসংস্কার বলে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য গান্ধারীর আবেদন কবিতায় কবি লিখেছেন-

“ধর্ম নহে সম্পদের হেতু

মহারাজ,নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু

ধর্মেই ধর্মের শেষ।”

কাজেই নৈতিক জীবনের কোন পূর্বাঙ্গ আছে না কি নৈতিকতা রক্ষা কেবল নৈতিকতা রক্ষার স্বার্থেই এককথায় তার সদুত্তর দেওয়া সমস্যার। এখানে বলা দরকার নৈতিকতা শব্দটি ভারতীয় দর্শনের কোন মূল গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়নি। ভারতীয় শাস্ত্রে ব্যবহৃত যে শব্দটি নৈতিকতার কাছাকাছি বলে ধরতে পারি সেটি হচ্ছে ধর্ম। তবে ধর্ম একটি বহুমাত্রিক শব্দ। সাধারণ অর্থে যাকে ‘Religion’ বলা হয় তা থেকে শুরু করে শব্দটির এমন গভীর থেকে গভীরতর অর্থের সন্ধান

পাওয়া যায় যার সঙ্গে পূজা প্রার্থনার ইত্যাদি প্রক্রিয়ার দূর-দূরান্তের সম্বন্ধও নেই। ঠিক কোথায় ধর্ম নৈতিকতার বাচক তা বুঝে নিতে গেলে শব্দটি ব্যবহারের ইতিহাসকে বিচারে রাখতে হবে। ধর্ম শব্দটি যদিও বহু অর্থে ব্যবহৃত সেই সমস্ত অর্থের মধ্যে কোনটি প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

এই গবেষণার অভিমুখ যেহেতু নিরীশ্বরবাদী নৈতিকতা সেহেতু ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায়গুলি ঈশ্বর ধারণা ব্যাতিরেকে নৈতিকতার কিরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই এই সন্দর্ভের মূল আলোচ্য। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে এই আলোচনা করতে গিয়ে সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে ৫ টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভূমিকা এবং উপসংহার।

এই গবেষণা নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘জড়বাদী চার্বাক পরম্পরায় নৈতিকতা’। এই অধ্যায়ে জড়বাদী ভাবনায় নৈতিকতার বিকল্প রূপ কেমন হতে পারে তারই আলোচনা করা হয়েছে। চার্বাকরা যে ধরণের নৈতিকতায় বিশ্বাসী তা একান্তই জড়বাদী ভোগবাদী এবং ইন্দ্রিয়সুখবাদী। ভারতীয় দর্শনের চার্বাক সম্প্রদায় একটি ব্যতিক্রমী অবস্থান নিয়েছে একদিকে আস্তিক্যবাদী ভারতীয় ধারা থেকে তারা যেমন আলাদা তেমনি নাস্তিক বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায় হতেও ভিন্ন। তারা একাধারে জড়সর্বস্ববাদী, ইন্দ্রিয়সর্বস্ববাদী এবং সুখসর্বস্ববাদী এরকম জড়সর্বস্ববাদী দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে স্বীকৃত হবে না তা বলাই বাহুল্য। আধ্যাত্মিক সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেও সুখসর্বস্ববাদ এবং আত্মসর্বস্ববাদ গ্রহণ করে কিভাবে নৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব তার অনুসন্ধান করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ‘নাস্তিক-নৈতিকতার জৈন ঐতিহ্য’। জৈন দর্শনে আলোচিত যে নীতিতত্ত্ব তা অধিবিদ্যার প্রতিসঙ্গী। জৈনরা যে আধিবিদ্যক মতবাদ গ্রহণ করেন

তাকে এককথায় বস্তুবাদী বহুত্ববাদ বা বহুত্ববাদী বস্তুবাদ বলে অভিহিত করা যায়। এই বহুত্ববাদী বস্তুবাদীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা এক ধরণের জ্ঞানতাত্ত্বিক আপেক্ষিকতাবাদ গ্রহণ করেছেন যাকে স্যাদবাদ নামে অভিহিত করা হয়। এই আপেক্ষিকতাবাদ গ্রহণ করেও তারা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যদিও আত্মবাদীদের মত তারা নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে থাকেন। জৈনমত অনুসারে পুদগলবন্ধনে আবদ্ধ এই আত্মা স্বরূপত নিত্য মুক্ত। পুদ্গল বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আত্মা বদ্ধ জীবে পরিণত হয়। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বদ্ধজীবকে নৈতিক আচরণে প্রবৃত্ত করে। সেই নৈতিক আচরণ কিভাবে পরিচালিত হয় বা ঐশী সত্তার স্বীকৃতি ব্যতীত সেই নৈতিক আচরণ কিভাবে সম্পাদিত হয় তারই সুলুকসন্ধান করা হবে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বৌদ্ধদর্শনে নিরীশ্বরবাদী ভাবনায় নৈতিকতার ব্যাখ্যা কিভাবে হতে পারে তারই আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায় একবাক্যে একথা স্বীকার করেন যে বৌদ্ধধর্ম এবং দর্শন হলো নৈতিকতার আকর। আর্যসত্য থেকে শুরু করে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পঞ্চশীল, ব্রহ্মবিহারভাবনা, ত্রিরত্ন-[শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা] এর অভ্যাস একথা প্রমাণ করে যে ব্যক্তির মুক্তি বা নির্বাণলাভ তার নিজের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি জীবের মধ্যে নির্বাণ লাভ করার সামর্থ্য রয়েছে। কোন মানুষ যদি বুদ্ধদেবের উপলব্ধ পথে কঠোর সাধনা করতে পারেন তাহলে তার নিজের সামর্থ্য দ্বারা সেই ব্যক্তির মুক্তি লাভ সম্ভব এর জন্য কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করা নিরর্থক। ঈশ্বর সংক্রান্ত আলোচনায় বৌদ্ধমত নিয়ে একটি অপব্যাখ্যার উল্লেখ এবং তার নিরসনের আলোচনাও রয়েছে এই অধ্যায়ে। বৌদ্ধসম্প্রদায় নিরীশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও মহাযানী বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ আছে বলে আপত্তি করা হয়েছে কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করেননি বুদ্ধদেবকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের আসনে অধিষ্ঠিত করে পূজার্চনা

করেছেন। এটার একটা বিকল্প ব্যাখ্যাও হতে পারে তৎকালীন সামাজিক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বৌদ্ধরা এই ধর্মকে সমাজের কাছে আরও বেশি করে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এবং কৌলিন্য বজায় রাখতে বুদ্ধদেবকে পূজার্চনা করেছেন কিন্তু কোন নিত্য, শাশ্বত, জগৎস্রষ্টা, জগতসংহারক রূপ ঈশ্বরে তারা বিশ্বাস করেননি। এছাড়া মহাযানী বৌদ্ধদের ঈশ্বরখন্ডন প্রসঙ্গে নাগার্জুনকৃত *ঈশ্বরকর্তৃকত্বনিরাকৃতি* এবং ধর্মকীর্তির *প্রমাণবার্তিক* গ্রন্থে যে যুক্তির উপস্থাপনা করা হয়েছে তারই আলোচনা রয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থাধ্যায়ে সাংখ্যের নৈতিকতা এবং নিরীশ্বরবাদের আলোচনা করা হয়েছে। আপাতভাবে নিরীশ্বরবাদী হিসাবে সাংখ্যের পরিচিতি হলেও প্রাচীন সাংখ্যাচার্যদের কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে করা হয়। এমনকি সাংখ্যের সমানতন্ত্র হিসেবে যে যোগ দর্শনের পরিচিতি সেখানে ঈশ্বর বিশ্বাসকে নৈতিক জীবন যাপনের প্রতিসঙ্গী হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। তাই সাংখ্যের নৈতিকতা ঈশ্বর বিশ্বাস নিরপেক্ষ বলে অনেকেই মেনে নিতে চাইবেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে নৈতিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের যোগ আবশ্যিক নয় বরং আকস্মিক। প্রথমে একথা মনে রাখতে হবে যে *সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, যুক্তিদীপিকা* প্রভৃতি উপলব্ধ গ্রন্থগুলিতে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বিবরণ রয়েছে সেখানে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ নেই। সাংখ্যতত্ত্ববিদ্যায় প্রকৃতি হতে জগতের অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে সেখানে প্রকৃতি পুরুষ সান্নিধ্যকে গুণবৈষম্য তথা অভিব্যক্তির নিমিত্ত হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। বন্ধন হতে জীবের মুক্তির যে প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে সেখানেও ঐশী করুণার কথা ব্যক্ত হয়নি। এপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত এবং তার অপব্যাখ্যার নিরসনও করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। সাংখ্যে জগতের

উৎপত্তি ও সাধকের মুক্তির জন্য অতিন্দ্রিয় ঈশ্বরের ভূমিকা স্বীকার না করে জড় জগতের আলোচনার উপর সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছেন। সাংখ্য মতে সৃষ্টির মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ দুটি তত্ত্ব প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ। মহর্ষি কপিল জগৎ বিষয়ক পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই পঞ্চবিংশতি জ্ঞান লাভ করতে পারলে ব্যক্তির কৈবল্যলাভ অবশ্যম্ভব। পঞ্চবিংশতি তত্ত্বগুলি হল– পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়– চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়– বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপাস্থ। পঞ্চতন্মাত্র– রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। পঞ্চমহাভূত– ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ৩টি অন্তকরণঃ – বুদ্ধি/মহৎ, অহংকার, মন। প্রকৃতি এবং পুরুষ/আত্মা।

পঞ্চম অধ্যায়ে মীমাংসাসম্মত নিরীশ্বরবাদ এবং নৈতিকতার আলোচনা করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শন মূলত কর্মের দর্শন বা কর্মমীমাংসা। কোন কাজ করণীয় বা বিধি কোন কাজ কর্তব্য নয় বরং নিষিদ্ধ তারই পাঠ দেওয়া হয়েছে জৈমিনির দর্শনে। মীমাংসা দর্শন বেদকে একমেবাদ্বিতীয়ম হিসেবে মেনেছে। যা বেদ অনুমোদিত তাই কর্ম বা ধর্ম; আর যা বেদবিহিত নয় তা নিষিদ্ধ বা অধর্ম। এভাবে ধর্মাধর্মের পাঠ বেদ থেকেই গ্রহণ করেছে মীমাংসা সম্প্রদায়। প্রশ্ন হল এভাবে বেদ নির্দিষ্ট পথে জীবনযাপনের প্রণোদন কি? মোক্ষবাদী দর্শন হিসেবে মীমাংসা দর্শনও দুঃখ থেকে একান্তমুক্ত হওয়ায় বৈদিক পথে জীবন যাপন একমাত্র উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু বেদকে ধর্মাধর্ম পাপ-পূণ্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে মান্যতা দেওয়ার হেতু কি? এখানে ন্যায় বৈশেষিকরা হয়তো ঈশ্বর রচিত হওয়ার কারণে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করবে। কিন্তু মীমাংসা মতে বেদ অপৌরষেয় এবং নিত্য। বেদ যেমন নিত্য তেমনি তা স্বতঃপ্রমাণ। স্বতঃপ্রমাণ সেই বেদের বিধি ও নিষেধকে মান্যতা দিয়ে জীবনযাপন মীমাংসা মতে মানব জীবনের নৈতিক আদর্শ। কাজেই এই দর্শনে নৈতিক জীবন যাপন পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বর

বিশ্বাস নিরপেক্ষ। কুমারিলভট্ট, প্রভাকর, পার্থসারথি মিশ্র কিভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যুক্তিপ্রদান করেছেন তার-ই আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

শেষ অধ্যায়ে অর্থাৎ উপসংহারে ভারতীয় নিরীশ্বরবাদী দর্শনে নৈতিকতার সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কোন আবশ্যিক সম্পর্ক আছে কিনা বা বিকল্প কোন ব্যাখ্যা আমরা পাই কি না তার আলোচনা রয়েছে। নাস্তিক দর্শনে এই দুইয়ের মধ্যে যে আবশ্যিক সম্পর্ক নেই সে বিষয়ে আভাস দিলে ও আস্তিক নিরীশ্বরবাদী দর্শনে ঈশ্বরবিশ্বাসকে বিকল্প পথ হিসেবে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য মুক্তিলাভ হলে তার উপায় হিসাবে যেমন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা পাই তেমনি ঈশ্বরবিশ্বাস আরেকটি বিকল্প হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু নৈতিকতার সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের সম্বন্ধ আবশ্যিক এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। যদিও এপ্রসঙ্গে স্বামীজি এবং ঋষি অরবিন্দের ভিন্নমত এখানে উল্লেখিত হয়েছে অতিলৌকিকে বা ঐশী সত্তায় বিশ্বাস ছাড়া কোন মানুষের নৈতিক বাধ্যতাবোধ তৈরী হতে পারে কি না সে বিষয়ে তারা প্রশ্ন রেখেছেন। কোন অলৌকিকের বিশ্বাস ছাড়া পরকল্যাণের আদর্শে মানুষ উদ্বুদ্ধ হতে পারে না বলে স্বামীজীর বিশ্বাস। একথা স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বামীজি বলেছেন- 'হিতবাদের (বা প্রয়োজনবাদের) আদর্শ মানুষের নৈতিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না। অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি, তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না'।

যে জিজ্ঞাসাটিকে সামনে রেখে এই গবেষণা কর্মটির সূত্রপাত ঘটেছিল তা হল নীতিনিষ্ঠ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরবিশ্বাস বা কোন অতিলৌকিকে বিশ্বাস অপরিহার্য পূর্বাঙ্গ হতে পারে কি

না? অন্যভাবে প্রশ্ন তোলা যায়, স্বাধীন বিচার বুদ্ধির আলোকে একজন মানুষ নৈতিক জীবনের অনুগামী হতে পারে কি না? এই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে ভারতীয় দর্শনে যে সকল নিরীশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সম্প্রদায় গুলির নীতিদর্শনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ওই দর্শন সম্প্রদায়গুলির প্রতিটি কোন না কোন ভাবে নৈতিক আদর্শে আস্থাশীল।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাসকে অবলম্বন করে নৈতিকতা পল্লবিত হওয়ার এই ঝোঁক কেন? এক বাক্যে এর উত্তর দেওয়া মুশকিল। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে অধিকাংশ মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল। নিজেকে বিচারশীল প্রাণী বলে জানলেও জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে সেই বিচার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের দ্বারা পরিচালিত হতে সে পারেনা। প্রায় ক্ষেত্রেই তার আচরণ আবেগ অনুভূতি ও জনপ্রিয় বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়। কেন সাম্প্রদায়িক পরম্পরা মেনে সে কোন আচরণ করবে তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে এমন একটা আখ্যান খাড়া করে যা তার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধির অনুমোদন করে না, শুধু সাধারণ মানুষ কেন দার্শনিক পরম্পরাতেও এমনটা ঘটেছে। জড়বাদ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবাদের যে ধারা চার্বাক প্রবর্তন করেছিল তার অনেকখানি স্থিমিত হয়েছে তথাকথিত সুশিক্ষিত চার্বাকদের মধ্যে। নৈয়ায়িকদের ষোড়শতত্ত্ব ও বৈশেষিকদের সপ্তপদার্থ বিভাজনে পৃথকভাবে ঈশ্বরের উল্লেখ নেই অথচ টীকাকারদের রচনায় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিচারসহ করে তোলার মরিয়া চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যের দ্বৈতবাদে জগতকে বুদ্ধিস্থ করার যে বিশুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী প্রয়াস ছিল অদ্বৈতির সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে তাই অনেকখানি ঈশ্বরবাদী হয়ে উঠেছে বিজ্ঞানভিক্ষুর হাতে। পদার্থবিদ নিউটনকে ঈশ্বরবাদী হিসেবে দেখার চেষ্টা, নিউট্রিনোকে ঈশ্বরকণা হিসেবে অভিহিত করা এসব থেকে স্পষ্ট হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকে অতিন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ঘটনাকে

আখ্যান্যের সঙ্গে যুক্ত করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে। এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বরবাদী নাকি নিরীশ্বরবাদী কোন ব্যাখ্যার সঙ্গে নৈতিক চিন্তা ও আচরণ বিশেষভাবে মানানসই? দার্শনিক বিচার এই দুইয়ের কোনটিকে সমর্থন করে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যখন দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প এসে হাজির হয় তখন সচরাচর কোনটির ব্যাখ্যা ক্ষমতা বেশি তা খতিয়ে দেখা হয়। যে প্রকল্প অধিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে সেটি গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয় বিজ্ঞানে। সে দিক থেকে দেখলে নৈতিকতার ঈশ্বরবাদী ব্যাখ্যা জনপ্রিয় হওয়ায় এটি বেশী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের স্বীকৃতি সব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতার নির্ণায়ক হয় না। টলেমির ভুকেন্দ্রিক আবর্তনের তত্ত্ব তার প্রমাণ। তাছাড়া অন্তত কিছু ক্ষেত্রে যদি ঈশ্বরবিশ্বাস নিরপেক্ষ ভাবে নৈতিক বিচার উন্মেষিত হতে দেখা যায় তাহলে ঈশ্বর বিশ্বাস কে আর নৈতিকতা বোধের অনিবার্য পূর্বাঙ্গ বলে গণ্য করা যায় না। ভারতীয় ঐতিহ্যে ব্যক্তি ভেদে মুক্তির নানা পথ স্বীকৃত হয়েছে কোথাও জ্ঞান, কোথাও কর্ম, কোথাও ভক্তি, কোথাও বা অন্য কোন পথে মোক্ষলাভ সম্ভব বলে গীতাকার থেকে শুরু করে স্বামীজি সকলেই এই মত পোষণ করেছেন। এই পরম্পরাকে বজায় রাখলে ব্যক্তি ভেদে নৈতিকতার ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দুটি ব্যাখ্যাই বৈকল্পিকভাবে গ্রহণ করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

অলকা তপস্বী, *থেরীগাথায় নারীজীবন*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৬।

ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, পুর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু শর্মা (অনুঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০০৭।

উমাস্বাতী, *তত্ত্বার্থসূত্র*, কে. কে দীক্ষিত (অনুঃ), আহমেদাবাদ, লালভাই দলপতভাই ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির, ২০০০।

কুমারিল ভট্ট, *শ্লোকবার্তিক*, গঙ্গানাথ ঝা (অনুঃ), শক্তিনগর, দিল্লী, শ্রীসদগুরু পাবলিকেশন, ১৯৮৩।

গঙ্গোপাধ্যায়, হেমন্ত, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, কলকাতা একাডেমি, ১৯৯৩।

ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, *শ্রীগীতা*, কলকাতা, প্রেসিন্ডেন্সী লাইব্রেরী, ২০২৪।

ঘোষাল, শিখা, *কান্টের নীতি দর্শন*, কলকাতা, ভারতীয় দর্শন পীঠ, ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, মালবিকা, *নৈতিকতা এবং নিরীশ্বরবাদ*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৮।

চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ, *সমগ্র সাংখ্যসমীক্ষা*, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৫।

চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *প্রসঙ্গ বৌদ্ধদর্শন*, কলকাতা সূত্রধর, ২০২৪।

চৌধুরী, সুকোমল, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৪।

চ্যাটার্জী, অমিতা (সম্পাদিত) *ভারতীয় ধর্মনীতি*, কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, অমিত ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬।

ধর্মানন্দ কোসাম্বী, *ভগবান বুদ্ধ*, চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, সাহিত্য একাডেমী, ২০০৭।

পুরকায়স্থ, বিজনবিহারী, *ভারতীয় দর্শনে নিরীশ্বরবাদ*, কলকাতা, ন্যাশানাল বুক এজেন্সী, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ, *ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ*, অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ৬২বি হিন্দুস্থান পার্ক, ১৯৫৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৩।

বসু, অরবিন্দ, *ধর্মদর্শন পরিচয়*, কলকাতা, মিত্রম, ২০১৪।

বসু, চারুচন্দ্র, *ধম্মপদ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০।

ভট্টাচার্য, অভিজিৎ, *জৈন তত্ত্বচেতনায় দার্শনিক চিন্তার স্বরূপ*, কলকাতা, মিত্রম, ২০১৪।

ভট্টাচার্য, অমলেশ, *মহাভারতের কথা*, কলকাতা, আর্যভারতী, ১৯৮৫।

ভট্টাচার্য, অমিত, *চার্বাক দর্শন*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১২ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস, কলকাতা, জেনারেল পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, পঞ্চানন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, কলিকাতা, কলকাতা প্রকাশক, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০২৪।

ভট্টাচার্য, সুখময়, *পূর্বমীমাংসা দর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০০৬।

ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *দেবতার মানবায়ন*, কলকাতা, আনন্দ, ২০১৮।

ভিক্ষু শীলভদ্র (সম্পাঃ), *দীঘনিকায়*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১১।

ভিক্ষু সুমনপাল (সম্পাঃ), *মধ্যম নিকায়*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৮।

মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *নীতি, যুক্তি ও ধর্ম*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৪।

মহর্ষি কপিল, *সাংখ্যদর্শনম্* (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য সহিত), মহেশচন্দ্র পাল (সম্পাঃ), কলকাতা, উপনিষদ কার্যালয়, ১৮০৭ শকাব্দ।

মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন* (দ্বিতীয় খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ) কলকাতা, পঃ বঃ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

মহর্ষি পতঞ্জলি, *পাতঞ্জল দর্শন*, পূর্ণচন্দ্র শর্মা বেদান্তচুঞ্চু (সংকলিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০০৫।

মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা, *ব্যক্তিচরিত্র ও নৈতিকতা*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১৫।

মোহান্ত, দিলীপকুমার, *কতিপয় দুর্লভ বৌদ্ধগ্রন্থ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২২।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী (সপ্তম খন্ড), বোলপুর, বিশ্বভারতী, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

লৌগাক্ষিভাস্কর, *অর্থসংগ্রহ*, স্বামী ভর্গানন্দ (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১১ বঙ্গাব্দ।

শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাক দর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ২০২৩।

শ্রী অরবিন্দ, *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি,* পন্ডিচেরী, অরবিন্দ আশ্রম, ২০১৫।

সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ, *মীমাংসা দর্শনম্* (প্রথম খন্ড), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৭।

সরখেল, রণজিত, *ভারতীয় দর্শনে অনীশ্বরবাদ,* কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৩।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (তৃতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১১।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (দ্বিতীয় খন্ড), অমিত ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৭।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সঞ্জিত কুমার সাধুখা (সম্পাঃ), কলকাতা, সদেশ, ২০১৬।

সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (সম্পাঃ), কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০২০।

সাহা, বিশ্বরূপ, *মীমাংসাপরিচয়,* কলকাতা, সংস্কৃতপুস্তক ভান্ডার, ২০০২।

সেন, অতুলচন্দ্র এবং মহেশচন্দ্র সেন (সম্পাঃ), উপনিষদ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ২০১৮।

সেনগুপ্তা, জ্যোতি, *সাংখ্যকারিকা,* কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৪।

স্বামী বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা* (তৃতীয় ও সপ্তম খন্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৬।

হালদার(দে), মণিকুন্তলা, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

Bhargava, Dayanand, *Jaina Ethics*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 1968.

Chaterjee, Satischandra, *An Introduction to Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2016.

Olivelle, Patrick*, Dharma studies in its semantic, cultural and religious history,* Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2004.

Prasad, Hari Sankar, *Ethics in Buddhism,* Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, 2007.

S, Radhakrishnan, *Indian Philosophy* (Vol-1), J.N Mohanty (ed.), Delhi, Oxford university press, 2008.

Sharma, I. C*, Ethical Philosophies of India,* London, George Allen & Unwin LTD, 1965.